চিলেকোঠা

ন্যাশনাল হাইওয়ে নম্বার ফর্টি থেকে ডাইনে রাস্তা ধরে দশ কিলোমিটার গেলেই ব্রহ্মপুর। মোড়টা আসার কিছু আগেই আদিত্যকে জিগ্যেস করলাম, 'কী রে, তোর জন্মস্থানটা একবার টুঁ মেরে যাবি নাকি? সেই যে ছেড়েচিস, তারপর তো আর আসিসনি।'

'তা আসিনি,' বলল আদিত্য, 'উনত্রিশ বছর। অবিশ্যি আমাদের বাড়িটা নির্ঘাত এখন ধ্বংসস্তূপ। যখন ছাড়ি তখনই বয়স ছিল প্রায় দুশো বছর। ইস্কুলটারও কী দশা জানি না। বেশি সংস্কার হয়ে থাকলে তো চেনাই যাবে না। ছেলেবেলার স্মৃতি ফিরে পাব এমন আশা করে গেলে ঠকতে হবে। তবে হ্যাঁ, নগাখুড়োর চায়ের দোকানটা এখনও থাকলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না।'

ধরলাম ব্রহ্মপুরের রাস্তা। আদিত্যদের জমিদারি ছিল ওখানে। স্বাধীনতার বছর খানেকের মধ্যেই আদিত্যর বাবা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুরের পাট উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন। আদিত্য ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল ব্রহ্মপুর থেকেই, কলেজের পড়াশুনা হয় কলকাতায়। তখন আমি ছিলাম ওর সহপাঠী। ছিয়াত্তরে আদিত্যর বাবা মারা যান। তারপর থেকে ছেলেই ব্যবসা দেখে। আমি ওর অংশীদার এবং বন্ধু। আমাদের নতুন ফ্যাক্টরি হচ্ছে দেওদারগঞ্জে, সেইটে দেখে ফিরছি আমরা। গাড়িটা আদিত্যরই। যাবার পথে ও চালিয়েছে, ফেরবার পথে আমি। এখন বাজে সাড়ে তিনটে। মাসটা মাঘ, রোদটা মিঠে, রাস্তার দু'ধারে দিগন্তবিস্তৃত খেতের ধান কাটা হয়ে গেছে কিছুদিন হল। ফসল এবার ভালই হয়েছে।

পাকা রাস্তা ধরে মিনিট দশেক চলার পরেই গাছপালা দালানকোঠা দেখা গেল। ব্রহ্মপুর হল যাকে বলে শহর বাজার জায়গা। লোকালয় আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই আদিত্য বলল, 'দাঁড়া।'

বাঁয়ে ইস্কুল। গেটের উপর অর্ধচন্দ্রাকৃতি লোহার ফ্রেমের ভিতর লোহার অক্ষরে লেখা 'ভিক্টোরিয়া হাইস্কুল, প্রতিষ্ঠা ১৮৭২'। গেট পেরিয়ে রাস্তার বাঁ পাশে খেলার মাঠ, রাস্তার শেষে দোতলা স্কুল বাড়ি। আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

'স্মৃতির সঙ্গে মিলছে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'আদপেই না,' বলল আদিত্য, 'আমাদের ইস্কুল ছিল একতলা, আর ডাইনে ও বিল্ডিংটা ছিল না। ওটা আমাদের হাডুডু খেলার জায়গা ছিল।'

'তুই তো ভাল ছাত্র ছিলি, তাই না?'

'তা ছিলুম, তবে আমার বাঁধা পোজিশন ছিল সেকেন্ড।'

'ভেতরে যাবি?'

'পাগল!'

মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে গাড়িতে ফিরে এলাম দুজনে।

'তোর সেই চায়ের দোকানটা কোথায় ?'

'এখান থেকে তিন ফার্লং। সোজা রাস্তা। একটা চৌমাথার মোড়ে। পাশেই একটা মুদির দোকান ছিল, আর উল্টোদিকে শিবমন্দির। পোড়া ইটের কাজ দেখতে আসত কলকাতা থেকে লোকেরা।'

আমরা আবার রওনা দিলাম।

'তোদের বাড়িটা কোথায় ?'

'শহরের শেষ মাথায়। ও বাড়ি দেখে মন খারাপ করার কোনও বাসনা নেই আমার।'

'তবু একবার যাবি না ?'

'সেটা পরে ভাবা যাবে। আগে চা।'

চৌমাথা এসে গেল দেখতে দেখতে। মন্দিরের চুড়োটা একটু আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল, কাছে যেতে আদিত্যর মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল একটা দোকানের উপর সাইনবোর্ডে—'নগেন'স টি ক্যাবিন'। পাশে মুদির দোকানটাও রয়েছে এখনও। আসলে ঊনত্রিশ বছরে মানুষের চেহারার অনেকটা পরিবর্তন হলেও, এইসব শহরের রাস্তাঘাট দোকানপাটের চেহারা খুব একটু বদলায় না।

শুধু দোকান নয়, দোকানের মালিকও বর্তমান। ষাটের উপর বয়স, রোগা পট্‌কা চাষাড়ে চেহারা, হিসেব করে আঁচড়ানো ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো, পরনে খাটো ধুতির উপর নীল ডোরা কাটা সার্টের তলার অংশটা দেখা যাচ্ছে সবুজ চাদরের নীচ দিয়ে।

'কোত্থেকে এলেন আপনারা ?' একবার গাড়ির দিকে, একবার দুই আগন্তুকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন নগেনবাবু। স্বভাবতই আদিত্যকে চিনতে পারার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

'দেওদারগঞ্জ', বলল আদিত্য, 'যাব কলকাতা।'

'এখানে— ?'

'আপনার দোকানে চা খেতে আসা।'

'তা খাবেন বইকী। শুধু চা কেন, ভাল বিস্কুট আছে, চানাচুর আছে।'

'বরং নানখাটাই দিন দুটো করে।'

আমরা দুটো টিনের চেয়ারে বসলাম। দোকানে আর লোক বলতে কোণের টেবিলে একজন মাত্র, যদিও তার সামনে খাদ্য বা পানীয় কিছুই নেই। মাথা হেঁট, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ও সান্ডেল মশাই', কোণের ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বেশ খানিকটা গলা তুলে বললেন নগেনবাবু—'চারটে বাজতে চলল। বাড়িমুখো হন এবার। অন্য খদ্দের আসার সময় হল।'—তারপর আমাদের দিকে ফিরে চোখ টিপে বললেন, 'কানে খাটো। চোখেও চালশে। তবে চশমা করাবেন সে সংগতি নেই।'

বুঝলাম এই ভদ্রলোকটি একটি মশকরার পাত্র। শুধু তাই না। নগেনবাবুর কথার যে প্রতিক্রিয়া হল, তাতে ভদ্রলোকের মাথার ঠিক আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আমাদের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য চেয়ে থেকে শরীরটাকে একবার ঝেড়ে নিয়ে সান্যাল মশাই তাঁর শীর্ণ ডান হাতটা বাড়িয়ে চাল্‌শে-পড়া চোখ দুটো পাকিয়ে শুরু করলেন আবৃত্তি—

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই, করো করো সবে সাজ,
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ—'

এই থেকে শুরু করে ভদ্রলোক বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দোকানের বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথের পণরক্ষা কবিতাটা পুরো আবৃত্তি করে, কোনও বিশেষ কাউকে লক্ষ না করেই একটা নমস্কার ঠুকে একটু যেন বেসামাল ভাবেই চৌরাস্তার একটা রাস্তা ধরে চলে গেলেন সোজা হয়তো তাঁর নিজের বাড়ির দিকেই। চৌরাস্তায় লোকের অভাব নেই, বিশেষত মন্দিরের সামনে আট-দশ জন লোক শুয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাদের কারুরই এই আবৃত্তি শুনে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। ব্যাপারটা যেন কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। আসলে পাগলের প্রলাপের বেশির ভাগটাই বাতাসে হারিয়ে যায়। তাতে কেউ কান দেয় না।

পাগল আরো ঢের দেখেছি, তাই ঘটনাটাকে আমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধা হল না। কিন্তু আদিত্যর দিকে চেয়ে বেশ একটু হকচকিয়ে গেলাম। তার চোখেমুখের ভাব পালটে গেছে। কারণ জিগ্যেস করাতে সে কোনও জবাব না দিয়ে নগেনবাবুকে প্রশ্ন করল, 'ভদ্রলোক কে বলুন তো ? করেন কী ?'

নগেনবাবু নিজের হাতেই দু' গেলাস চা আর একটা প্লেটে চারটে নানখাটাই আমাদের সামনে এনে রেখে বললেন, 'শশাঙ্ক সান্যাল ? কী আর করবে। অভিশপ্ত জীবন মশাই, অভিশপ্ত জীবন ! চোখ-কানের কথা তো বললুম ; মাথাটাও গেছে বোধ হয়। তবে পুরোনো কথা একটিও ভোলেনি। ইস্কুলে শেখা আবৃত্তি শুনিয়ে শুনিয়ে ব্রহ্মপুরের সকলের কান পচিয়ে দিয়েছে। ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, বাপ মরেছে অনেক কাল। সামান্য জমিজমা ছিল। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে তার বেশির ভাগটাই গেছে। বউও মরেছে বছর পাঁচেক হল। একটি ছেলে ছিল, বি কম পাশ করে চাকরি পেয়েছিল কলকাতায়—মিনিবাস থেকে পড়ে মারা গেছে গত বছর। সেই থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'কোথায় থাকেন ?

'যোগেশ কোবরেজ ছিলেন ওর বাপের বন্ধু ; তাঁরই বাড়িতে একটা ঘরে থাকেন, ওঁরা দুবেলা দুটি খেতে দেন। আমার এখানে এসে চা বিস্কুট খান ওই কোণে বসে। পেমেন্টটিও করা চাই, কারণ আত্মসম্মানবোধটি আছে পুরোমাত্রায়। যদিও এ ভাবে ক'দিন চলবে জানি না। সব মানুষের সময় তো সমান যায় না। আপনারা কলকাতার লোক। ঢের বেশি দেখেছেন আমাদের চেয়ে। আপনাদের আর কী বলব।'

'যোগেশ কবিরাজের বাড়ি চড়কের মাঠটার পশ্চিম দিকে না ?'

'আপনি তো জানেন দেখছি ! ব্রহ্মপুরে কি— ?'

'এককালে যোগাযোগ ছিল একটু।'

নগেনবাবুর কাছে অন্য খদ্দের এসে পড়ায় কথা আর এগোল না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। গাড়ির চারপাশে ছেলেছোকরাদের একটু জটলা হয়েছে এরই মধ্যে, তাদের সরিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। এবার আদিত্যই স্টিয়ারিং ধরল।

বলল, 'আমাদের বাড়িটা একটু ঘুরপ্যাঁচের রাস্তা। আমিই চালাই।'

'তা হলে বাড়িটা দেখার ইচ্ছে জেগেছে বল।'

'ওটা এসেনশিয়্যাল হয়ে পড়েছে।'

তাকে দেখে মনে হল আদিত্যকে জিগ্যেস করেও ওর মত পরিবর্তনের কারণটা এখন জানা যাবে না। ওর স্নায়ুগুলো যেন সব টান টান হয়ে আছে।

আমরা রওনা দিলাম।

চৌমাথার পুবের রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে ডাইনে বাঁয়ে খান কয়েক মোড় ঘুরে অবশেষে একটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ির পাশে এসে পড়লাম। নহবতখানা সমেত জীর্ণ ফটকটায় এসে পৌঁছতে আরেকটা মোড় নিতে হল।

চারমহলা বাড়িটা যে এককালে খুবই জাঁদরেল ছিল সেটা আর বলে দিতে হয় না, যদিও এখন অবস্থাটা কঙ্কালসার। হানাবাড়ি হলেও আশ্চর্য হব না। বাড়ির গায়ে লটকানো একটা ভাঙা সাইনবোর্ড থেকে জানা যায় একটা সময় কোনও এক উন্নয়ন সমিতির অফিস ছিল এখানে। এখন একেবারে পরিত্যক্ত।

ফটক দিয়ে ঢুকে আগাছায় ঢাকা পথ দিয়ে আদিত্য গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে সদর দরজার সামনে দাঁড় করাল। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় বছর দশেকের মধ্যে এ তল্লাটে কেউ আসেনি। বাড়ির সামনেটায় বাগান ছিল বোঝা যায়। এখন সেখানে জঙ্গল।

'তুই কি ভিতরে ঢোকার মতলব করছিস নাকি ?'

আমি জিগ্যেস করতে বাধ্য হলাম, কারণ আদিত্য গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

'ভেতরে না ঢুকলে ছাদে ওঠা যাবে না।'

'ছাদে ?'

'চিলেকোঠায়', রহস্য আরো ঘন করে বলল আদিত্য।

অগত্যা আমিও গেলাম পিছন পিছন, কারণ তাকে নিরস্ত করা যাবে বলে মনে হল না।

বাড়ির ভিতরের অবস্থা আরো শোচনীয়। কড়ি-বরগাগুলো দেখে মনে হয় তাদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, ছাদ ধসে পড়তে আর বেশিদিন নেই। সামনের ঘরটা বাইরের মহলের বৈঠকখানা। তাতে খান তিনেক ভাঙা আসবাব কোণে ডাঁই করা রয়েছে, মেঝেতে সাতপুরু ধুলো।

বৈঠকখানার পর বারান্দা পেরিয়ে ঠাকুরদালানের ভগ্নাবশেষ। এখানে কত পুজো, কত যাত্রা, কত কবিগান, পাঁচালি আর কবির লড়াই হয়েছে তার গল্প আদিত্যর কাছে শুনেছি। এখন এখানে পায়রা ইঁদুর বাদুড় আর আরশোলার রাজত্ব। ইটের ফাটলের মধ্যে বেশ কিছু বাস্তু সাপ থেকে থাকলেও আশ্চর্য হব না।

ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়েই সিঁড়ি। দৃশ্য এবং অদৃশ্য মাকড়সার জাল দু'হাত দিয়ে সরাতে সরাতে আমরা উপরে উঠলাম। দোতলায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাই ডাইনে ঘুরে আরো খান পনেরো সিঁড়ি উঠে ছাদে পৌঁছলাম।

এই হল চিলেকোঠা।

'এটা আমার প্রিয় ঘর ছিল', বলল আদিত্য। ছেলেবেলায় চিলেকোঠার প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে জানি। আমারও ছিল। বাড়ির সব ঘরের মধ্যে এই ঘরটাতেই একাধিপত্যের সবচেয়ে বেশি সুযোগ।

এই বিশেষ চিলেকোঠাটির এক দিকে দেয়ালের খানিকটা অংশ ধসে পড়াতে একটা কৃত্রিম জানালার সৃষ্টি হয়েছে, যার ভিতর দিয়ে বাইরের আকাশ, মাঠ, ধানকলের খানিকটা অংশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর পোড়া ইটের মন্দিরের চুড়ো, সবই দেখা যাচ্ছে। সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটার অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়, কারণ ঝড়ঝঞ্ঝা বয়েছে বাড়ির মাথার উপর দিয়েই সবচেয়ে বেশি। মেঝেয় চতুর্দিকে খড়কুটো আর পায়রার বিষ্ঠা। এ ছাড়া এক কোণে আছে একটা ভাঙা আরামকেদারা, একটা ভাঙা ক্রিকেট ব্যাট, একটা দুমড়ানো বেতের ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, আর একটা কাঠের প্যাকিং বাক্স।

আদিত্য প্যাকিং কেসটা ঘরের এক দিকে টেনে এনে বলল, 'যদি কাঠ ভেঙে পড়ি তা হলে তোর উপর ভরসা। দুর্গা দুর্গা।'

উঁচুতে ওঠার কারণ আর কিছুই না, ঘুলঘুলিতে হাত পাওয়া। সেখানে হাতড়ানোর ফলে একটি চড়ুই দম্পতির ক্ষতি হল, কারণ তাদের সদ্য তৈরি বাসাটি স্থানচ্যুত হয়ে মেঝের আরো বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খড়কুটোয় ভরে দিল।

'যাক্, বাব্বাঃ !'

বুঝলাম আদিত্য যা খুঁজছিল সেটা পেয়েছে। জিনিসটা এক ঝলক দেখে সেটাকে একটা ক্যারমের স্ট্রাইকার বলে মনে হল। কিন্তু সেটা এখানে লুকোনো কেন, আর উনত্রিশ বছর পর সেটা উদ্ধার করার প্রয়োজন হল কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না।

আদিত্য জিনিসটাকে রুমালে ঘষে পকেটে পুরল। ওটা কী জিগ্যেস করতে বলল, 'একটু পরেই বুঝবি।'

নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠে আবার ফিরতি পথ ধরলাম। চৌমাথার কাছাকাছি এসে আদিত্য একটা দোকানের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করাল। নামলাম দু'জনে।

ক্রাউন জুয়েলার্স।

দু'জনে গিয়ে ঢুকলাম স্যাকরার দোকানে।

'এই জিনিসটা একবার দেখবেন?' পকেট থেকে বার করে পুরু চশমা পরা বৃদ্ধ মালিকের হাতে জিনিসটা তুলে দিল আদিত্য।

ভদ্রলোক চাকতিটা চোখের সামনে ধরলেন। এবার আমি বুঝতে পেরেছি জিনিসটা কী।

'এ তো অনেক পুরোনো জিনিস দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ জিনিস তো আজকাল আর এত বড় দেখা যায় না।'

'এটা যদি একবারটি ওজন করে দেখে দেন।'

বৃদ্ধ নিক্তিটা কাছে টেনে এনে তাতে কালসিটে পড়া চাকতিটা চাপালেন।

নেকস্ট্ স্টপ যোগেশ কবিরাজের বাড়ি। আমার মনের কোণে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু আদিত্যর মুখের ভাব দেখে তাকে আর কিছু জিগ্যেস করলাম না।

কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ির বাইরে দুটি বছর দশেকের ছেলে বসে মার্বেল খেলছিল। গাড়ি আসতে দেখে তারা গভীর কৌতূহলের সঙ্গে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তাদের জিগ্যেস করতে বলল সান্যাল মশাই থাকেন সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকের ঘরে।

সামনের দরজা খোলাই ছিল। বাঁয়ের ঘর থেকে আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আরো এগোতে বুঝলাম সান্যাল মশাই আপন মনে আবৃত্তি করে চলেছেন। দেবতার গ্রাস। আমরা ঘরের দরজার মুখটায় গিয়ে দাঁড়াতেও সে আবৃত্তি চলল যতক্ষণ না কবিতা শেষ পংক্তিতে পৌঁছায়। আমরা যে এসে দাঁড়িয়েছি সেটা যেন তাঁর খেয়ালই নেই।

'একটু আসতে পারি?' আদিত্য জিগ্যেস করল আবৃত্তি শেষ হবার পর।

ভদ্রলোক ঘুরে দেখলেন আমাদের দিকে।

'আমার এখানে তো কেউ আসে না।'

ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। আদিত্য বলল, 'আমরা এলে আপত্তি আছে কি?'

'আসুন।'

আমরা ঢুকলাম গিয়ে ঘরের ভিতর। তক্তপোষ ছাড়া বসবার কিছু নেই। দু'জনে দাঁড়িয়েই রইলাম। সান্যাল মশাই চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

'আদিত্যনারায়ণ চৌধুরীকে আপনার মনে আছে?' আদিত্য প্রশ্ন করল।

'বিলক্ষণ,' বললেন ভদ্রলোক। 'আলালের ঘরের দুলাল। ছাত্র ভালই ছিল, তবে আমাকে কোনওদিন টেক্কা দিতে পারেনি। হিংসে করত। প্রচণ্ড হিংসে। আর মিথ্যে কথা বলত।'

'জানি,' বলল আদিত্য। তারপর পকেট থেকে একটা মোড়ক বার করে সান্যালের হাতে দিয়ে বলল, 'এইটে আদিত্য আপনাকে দিয়েছে।'

'ওটা কী?'

'টাকা।'

'টাকা ? কত টাকা ?'

'দেড়শো। বলেছে এটা আপনি নিলে সে খুশি হবে।'

'হাসব না কাঁদব ? আদিত্য টাকা দিয়েছে আমায় ? হঠাৎ এ মতি হল কেন ?'

'সময়ের প্রভাবে তো মানুষ বদলায়। আদিত্য এখন হয়তো আর সে আদিত্য নেই।'

'আদিত্য বদলাবে ? প্রাইজ পেলুম আমি। উকিল রামশরণ বাঁড়ুজ্যের নিজের হাতে দেওয়া মেডেল। সেটা তার সহ্য হল না। সে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেল তার বাপকে দেখাবে বলে। তারপর আর ফেরতই দিলে না। বললে পকেটে ফুঁটো ছিল; গলে পড়ে গেছে।'

'এটা সেই মেডেলেরই দাম। আপনার পাওনা।'

সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আদিত্যর দিকে চেয়ে বলল, 'মেডেলের দাম কী রকম ? সে তো বড় জোর পাঁচ টাকা। রুপোর মেডেল তো !'

'রুপোর দাম ত্রিশগুণ বেড়ে গেছে।'

'বটে ? আশ্চর্য ! এ খবর তো জানতুম না। তবে...'

সান্যাল মশাই হাতের পনেরোটা দশ টাকার নোটের দিকে দেখলেন। তারপর মুখ তুলে চাইলেন আদিত্যর দিকে। এবার তাঁর চোখেমুখে এক অদ্ভুত নতুন ভাব। বললেন, 'এতে যে বড্ড চ্যারিটির গন্ধ এসে পড়ছে, আদিত্য !'

আমরা চুপ। সান্যাল মিটিমিটি চোখে চেয়ে আছেন আদিত্যর দিকে। তারপর মাথা নেড়ে হেসে বললেন, 'তোমার ডান গালের ওই আঁচিল দেখে নগাখুড়োর চায়ের

দোকানেই আমি চিনে ফেলেছি তোমায়। আমি বুঝেছি তুমি আমায় চেনোনি, তাই সেই প্রাইজের দিনের কবিতাটাই আবৃত্তি করলুম, যদি তোমার মনে পড়ে। তারপর যখন দেখলুম তুমি আমার বাড়িতেই এলে, তখন কিছু পুরোনো ঝাল না ঝেড়ে পারলুম না।'

'ঠিকই করেছ,' বলল আদিত্য, 'তোমার প্রত্যেকটা অভিযোগ সত্যি। কিন্তু এ টাকা তুমি নিলে আমি খুশি হব।'

'উঁহু', মাথা নাড়লেন শশাঙ্ক সান্যাল। 'টাকা তো ফুরিয়ে যাবে, আদিত্য। বরং মেডেলটা যদি থাকত তা হলে নিতুম। আমার ছেলেবেলার ওই একটি অপ্রিয় ঘটনা আমি ভুলে যেতুম মেডেলটা পেলে। আমার মনে আর কোনও খেদ থাকত না।'

চিলেকোঠাতে উনত্রিশ বছর লুকিয়ে রাখা মেডেল যার জিনিস তার কাছেই আবার চলে এল। এতদিনেও তার গায়ে খোদাই করে লেখাটা ম্লান হয়নি—'শ্রীমান শশাঙ্ক সান্যাল—আবৃত্তির জন্য বিশেষ পুরস্কার—১৯৪৮'।